

# অভাগীর স্বর্ণ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[লেখক-পরিচিতি : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। আর্থিক সংকটের কারণে এফ.এ. শ্রেণিতে পড়ার সময় তাঁর ছাত্রজীবনের অবসান ঘটে। তিনি কিছুদিন ভবঘুরে হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেন। পরে ১৯০৩ সালে ভাগ্যের সন্ধানে বার্মা (বর্তমানে মায়ানমার) যান এবং রেঙ্গুনে অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অফিসে কেরানি পদে চাকরি করেন। প্রবাস জীবনেই তাঁর সাহিত্য-সাধনা শুরু এবং তিনি অল্পদিনেই খ্যাতি লাভ করেন। ১৯১৬ সালে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন এবং নিয়মিতভাবে সাহিত্য-সাধনা করতে থাকেন। গল্প, উপন্যাস রচনার পাশাপাশি তিনি কিছু প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু পরে তা ত্যাগ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, বড়দিদি, বিরাজ বৌ, রামের সুমতি, দেবদাস, বিন্দুর ছেলে, পরিণীতা, পণ্ডিতমশাই, মেজদিদি, পল্লিসমাজ, বৈকুণ্ঠের উইল, শ্রীকান্ত, চরিত্রহীন, দত্তা, ছবি, গৃহদাহ, দেনা পাওনা, পথের দাবী, শেষ প্রশ্ন ইত্যাদি। শরৎচন্দ্র ১৬ই জানুয়ারি ১৯৩৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।]

ঠাকুরদাস মুখুয়ের বর্ষীয়সী স্ত্রী সাতদিনের জুরে মারা গেলেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ধানের কারবারে অতিশয় সঙ্গতিপন্ন। তাঁর চার ছেলে, তিন মেয়ে, ছেলেমেয়েদের ছেলেপুলে হইয়াছে, জামাইরা-প্রতিবেশীর দল, চাকর-বাকর - সে যেন একটা উৎসব বাঁধিয়া গেল। সমস্ত গ্রামের লোক ধুমধামের শব্দযাত্রা ভিড় করিয়া দেখিতে আসিল। মেয়েরা কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের দুই পায়ে গাঢ় করিয়া আলতা এবং মাথায় ঘন করিয়া সিন্দুর লেপিয়া দিল, বধূরা ললাট চন্দনে চর্চিত করিয়া বহুমূল্য বস্ত্রে শাওড়ির দেহ আচ্ছাদিত করিয়া দিয়া আঁচল দিয়া তাঁহার শেষ পদধূলি মুছাইয়া লইল। পুস্প, পত্র, গন্ধে, মাল্যে, কলরবে মনে হইল না এ কোনো শোকের ব্যাপার-এ যেন বড়বাড়ির গৃহিণী পঞ্চাশ বর্ষ পরে আর একবার নূতন করিয়া তাঁহার স্বামীগৃহে যাত্রা করিতেছেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় শান্তমুখে তাঁহার চিরদিনের সঙ্গিনীকে শেষ বিদায় দিয়া অলঙ্কে দুফোঁটা চোখের জল মুছিয়া শোকার্ত কন্যা ও বধূগণকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। প্রবল হরিধ্বনিতে প্রভাত-আকাশ আলোড়িত করিয়া সমস্ত গ্রাম সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আর একটি প্রাণী একটু দূরে থাকিয়া এই দলের সঙ্গী হইল। সে কাঙালীর মা। সে তাহার কুটির-প্রাঙ্গণে গোটা-কয়েক বেগুন তুলিয়া এই পথে হাটে চলিয়াছিল, এই দৃশ্য দেখিয়া আর নড়িতে পারিল না। রহিল তাহার হাটে যাওয়া, রহিল তাহার আঁচলেবেগুন বাঁধা,-সে চোখের জল মুছিতে মুছিতে সকলের পিছনে শাশানে আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রামের একান্তে গরুড়-নদীর তীরে শাশান। সেখানে পূর্বাফেই কাঠের ভার, চন্দনের টুকরা, ঘৃত, মধু, ধূপ, ধুনা প্রভৃতি উপকরণ সঞ্চিত হইয়াছিল, কাঙালীর মা ছোটজাত, দুলের মেয়ে বলিয়া কাছে বাইতে সাহস পাইল না, তফাতে একটা উঁচু টিপির মধ্যে দাঁড়াইয়া সমস্ত অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উৎসুক আগ্রহে চোখ মেলিয়া দেখিতে লাগিল। প্রশস্ত ও পর্যাণ্ড চিতার পরে যখন শব স্থাপিত করা হইল তখন তাঁহার রাঙা পা-দুখানি দেখিয়া তাহার দু'চক্ষু জুড়াইয়া গেল, ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া একবিন্দু আলতা মুছাইয়া লইয়া মাথায় দেয়। বহুকণ্ঠের হরিধ্বনির সহিত পুত্রহস্তের মন্ত্রপূত অগ্নি যখন সংযোজিত হইল তখন তাহার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল,

মনে মনে বারংবার বলিতে লাগিল, ভাগ্যমানী মা, তুমি সগে যাচ্চো-আমাকেও আশীর্বাদ করে যাও, আমিও যেন এমনি কাঙালীর হাতের আঙনটুকু পাই। ছেলের হাতের আঙন! সে ত সোজা কথা নয়! স্বামী, পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতনী, দাস, দাসী পরিজন-সমস্ত সংসার উজ্জ্বল রাখিয়া এই যে স্বর্গারোহণ- দেখিয়া তাহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল,- এ সৌভাগ্যের সে যেন আর ইয়ত্তা করিতে পারিল না। সদ্য-প্রজ্বলিত চিতার অজস্র ধূয়া নীল রঙের ছায়া ফেলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল, কাঙালীর মা ইহারই মধ্যে ছোট একখানি রথের চেহারা যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল। গায়ে তাহার কত না ছবি আঁকা, চুড়ায় তাহার কত না লতাপাতা জড়ানো। ভিতরে কে যেন বসিয়া আছে-মুখ তাহার চেনা যায় না, কিন্তু সিঁথায় তাঁহার সিঁদুরের রেখা, পদতল- দুটি আলতায় রাঙানো। উর্ধ্বদৃষ্টে চাহিয়া কাঙালীর মায়ের দুই চোখে অশ্রুর ধারা বহিতেছিল, এমন সময়ে একটি বছর চোন্দ-পনরর ছেলে তাহার আঁচলে টান দিয়া কহিল, হেথায় তুই দাঁড়িয়ে আছিস মা, ভাত রাঁধবি নে?

মা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, রাঁধবো'খন রে! হঠাৎ উপরে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ব্যগ্রস্বরে কহিল, দ্যাখ দ্যাখ বাবা,-বামুন-মা ওই রথে চড়ে সগে যাচ্ছে!

ছেলে বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া কহিল, কৈ? ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া শেষে বলিল, তুই ফেপেছিস! ও ত ধূয়া! রাগ করিয়া কহিল, বেলা দুপুর বাজে, আমার ক্ষিদে পায় না বুঝি? এবং সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চোখে জল লক্ষ্য করিয়া বলিল, বামুনদের গিনি মরছে তুই কেন কেঁদে মরিস মা?

কাঙালীর মার এতক্ষণে হুঁশ হইল। পরের জন্য শাশানে দাঁড়াইয়া এইভাবে অশ্রুপাত করায় সে মনে মনে লজ্জা পাইল, এমন কি, ছেলের অকল্যাণের আশঙ্কায় মুহূর্তে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, কাঁদব কিসের জন্যে রে!- চোখে ধোঁ লেগেছে বৈ ত নয়!

হাঃ-ধোঁ লেগেছে বৈ ত না! তুই কাঁদতেছিলি!

মা আর প্রতিবাদ করিল না। ছেলের হাত ধরিয়া ঘাটে নামিয়া নিজেও স্নান করিল, কাঙালীকেও স্নান করাইয়া ঘরে ফিরিল,-শাশান-সৎকারের শেষটুকু দেখা আর তার ভাগ্যে ঘটিল না।

সন্তানের নামকরণকালে পিতামাতার মৃত্যুতায় বিধাতাপুরুষ অন্তরীক্ষে থাকিয়া অধিকাংশ সময়ে শুধু হাস্য করিয়াই ক্ষান্ত হন না, তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাই তাহাদের সমস্ত জীবনটা তাহাদের নিজের নামগুলোকেই যেন আমরণ ভ্যাঙচাইয়া চলিতে থাকে। কাঙালীর মার জীবনের ইতিহাস ছোটো, কিন্তু সেই ছোট কাঙালজীবনটুকু বিধাতার এই পরিহাসের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। তাহাকে জন্ম দিয়া মা মরিয়াছিল, বাপ রাগ করিয়া নাম দিল অভাগী। মা নাই, বাপ নদীতে মাছ ধরিয়া বেড়ায়, তাহার না আছে দিন, না আছে রাত। তবু যে কি করিয়া ক্ষুদ্র অভাগী একদিন কাঙালীর মা হইতে বাঁচিয়া রহিল সে এক বিস্ময়ের বস্তু। যাহার সহিত বিবাহ হইল তাহার নাম রসিক বাঘ, বাঘের অন্য বাঘিনী ছিল, ইহাকে লইয়া সে গ্রামান্তরে উঠিয়া গেল, অভাগী তাহার অভাগ্য ও শিশুপুত্র কাঙালীকে লইয়া গ্রামেই পড়িয়া রহিল।

তাহার সেই কাঙালী বড়ো হইয়া আজ পনরয় পা দিয়াছে। সবেমাত্র বেতের কাজ শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, অভাগীর আশা হইয়াছে আরও বছরখানেক তাহার অভাগ্যের সহিত যুঝিতে পারিলে দুঃখ ঘুচিবে। এই দুঃখ যে কি, যিনি দিয়াছেন তিনি ছাড়া আর কেহই জানে না।

কাঙালী পুকুর হইতে আঁচাইয়া আসিয়া দেখিল তাহার পাতের ভুজাবশেষ মা একটা মাটির পাতে ঢাকিয়া রাখিতেছে, আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুই খেলি নে মা?

বেলা গড়িয়ে গেছে বাবা, এখন আর ক্ষিদে নেই।

ছেলে বিশ্বাস করিল না, বলিল, না, ক্ষিদে নেই বৈ কি! কৈ, দেখি তোর হাঁড়ি?

এই ছলনায় বহুদিন কাঙালীর মা কাঙালীকে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে। সে হাঁড়ি দেখিয়া তবে ছাড়িল। তাহাতে আর একজনের মত ভাত ছিল। তখন সে প্রসন্নমুখে মায়ের কোলে গিয়া বসিল। এই বয়েসের ছেলে সচরাচর এরূপ করে না, কিন্তু শিশুকাল হইতে বহুকাল যাবৎ সে রুগ্ন ছিল বলিয়া মায়ের ক্রোড় ছাড়িয়া বাহিরের সঙ্গীসাথীদের সহিত মিশিবার সুযোগ পায় নাই। এইখানে বসিয়াই তাহাকে খেলাধুলার সাধ মিটাইতে হইয়াছে।

একহাতে গলা জড়াইয়া, মুখের উপর মুখ রাখিয়াই কাঙালী চকিত হইয়া কহিল, মা, তোর গা যে গরম, কেন তুই অমন রোদে দাঁড়িয়ে মড়া-পোড়ানো দেখতে গেলি? কেন আবার নেয়ে এলি? মড়া-পোড়ানো কি তুই—

মা শশব্যস্তে ছেলের মুখে হাত চাপা দিয়া কহিল, ছি বাবা, মড়া-পোড়ানো বলতে নেই, পাপ হয়। সতী-লক্ষ্মী মা-ঠাকরন রথে করে সগেয়ে গেলেন।

ছেলে সন্দেহ করিয়া কহিল, তোর এক কথা মা! রথে চড়ে কেউ নাকি আবার সগেয়ে যায়।

মা বলিল, আমি যে চোখে দেখনু কাঙালী, বামুন-মা রথের উপরে বসে। তেনার রাজা পা-দুখানি যে সবাই চোখ মেলে দেখলে রে!

সবাই দেখলে?

সবাই দেখলে।

কাঙালী মায়ের বুকে ঠেস দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মাকে বিশ্বাস করাই তাহার অভ্যাস, বিশ্বাস করিতেই সে শিশুকাল হইতে শিক্ষা করিয়াছে, সেই মা যখন বলিতেছে সবাই চোখ মেলিয়া এত বড়ো ব্যাপার দেখিয়াছে, তখন অবিশ্বাস করিবার আর কিছু নাই। খানিক পরে আস্তে আস্তে কহিল, তাহলে তুইও ত মা সগেয়ে যাবি? বিন্দির মা সেদিন রাখালের পিসিকে বলতেছিল, ক্যাঙলার মার মত সতী-লক্ষ্মী আর দুলে-পাড়ায় নেই।

কাঙালীর মা চুপ করিয়া রহিল, কাঙালী তেমনি ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল, বাবা যখন তোরে ছেড়ে দিলে, তখন তোরে কত লোকে ত নিকে করতে সাধাসাধি করলে। কিন্তু তুই বললি, না। বললি, ক্যাঙালী বাঁচলে আমার দুঃখ ঘুচবে, আবার নিকে করতে যাবো কিসের জন্যে? হাঁ মা, তুই নিকে করলে আমি কোথায় থাকতুম? আমি হয়ত না খেতে পেয়ে এতদিনে কবে মরে যেতুম।

মা ছেলেকে দুই হাতে বুকে চাপিয়া ধরিল। বস্তুত সেদিন তাহাকে এ পরামর্শ কম লোকে দেয় নাই, এবং যখন সে কিছুতেই রাজি হইল না, তখন উৎপাত-উপদ্রবও তাহার প্রতি সামান্য হয় নাই, সেই কথা স্মরণ করিয়া অভাগীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ছেলে হাত দিয়া মুছাইয়া দিয়া বলিল, কঁাতাটা পেতে দেব মা, শুবি?

মা চুপ করিয়া রহিল। কাঙালী মাদুর পাতিল, কাঁথা পাতিল, মাচার উপর হইতে ছোট বালিশটি পাড়িয়া দিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে বিছানায় টানিয়া লইয়া যাইতে, মা কহিল, কাঙালী, আজ তোরা আর কাজে গিয়ে কাজ নেই।

কাজ কামাই করিবার প্রস্তাব কাঙালীর খুব ভালো লাগিল, কিন্তু কহিল, জলপানির পয়সা দুটো ত তা হলে দেবে না মা!

না দিক গে, -আয় তোকে রূপকথা বলি।

আর প্রলুব্ধ করিতে হইল না, কাঙালী তৎক্ষণাৎ মায়ের বুক ঘেঁষিয়া শুইয়া পড়িয়া কহিল, বল্ তা হলে। রাজপুত্র, কোটালপুত্র আর সেই পক্ষীরাজ ঘোড়া -

অভাগী রাজপুত্র, কোটালপুত্র আর পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা দিয়া গল্প আরম্ভ করিল। এ-সকল তাহার পরের কাছে কতদিনের শোনা এবং কতদিনের বলা উপকথা। কিন্তু মুহূর্ত-কয়েক পরে কোথায় গেল তাহার রাজপুত্র, আর কোথায় গেল তাহার কোটালপুত্র-সে এমন উপকথা শুরু করিল যাহা পরের কাছে তাহার শেখা নয়- নিজের সৃষ্টি। জ্বর তাহার যত বাড়িতে লাগিল, উষ্ণ রক্তস্রোত যত দ্রুতবেগে মস্তিষ্কে বহিতে লাগিল, ততই সে যেন নব নব উপকথার ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া চলিতে লাগিল। তাহার বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই- কাঙালীর স্বল্প দেহ বার বার রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। ভয়ে, বিস্ময়ে, পুলকে সে সজোরে মায়ের গলা জড়াইয়া তাহার বুকের মধ্যে যেন মিশিয়া যাইতে চাহিল।

বাহিরে বেলা শেষ হইল, সূর্য অস্ত গেল, সন্ধ্যার ম্লান ছায়া গাঢ়তর হইয়া চরাচর ব্যাপ্ত করিল, কিন্তু ঘরের মধ্যে আজ আর দীপ জ্বলিল না, গৃহস্থের শেষ কর্তব্য সমাধা করিতে কেহ উঠিল না, নিবিড় অন্ধকারে কেবল রুগ্ন মাতার অবাধ গুঞ্জন নিস্তব্ধ পুত্রের কর্ণে সুধাবর্ষণ করিয়া চলিতে লাগিল। সে সেই শ্মশান ও শ্মশানযাত্রার কাহিনি। সেই রথ, সেই রাজা পা-টি, সেই তাঁর স্বর্গে যাওয়া। কেমন করিয়া শোকাক্ত স্বামী শেষ পদধূলি দিয়া কাঁদিয়া বিদায় দিলেন, কি করিয়া হরিধ্বনি দিয়া ছেলেরা মাতাকে বহন করিয়া লইয়া গেল, তার পরে সন্তানের হাতের আঙুন। সে আঙুন ত আঙুন নয় কাঙালী, সে ত হরি! তার আকাশজোড়া ধূয়ো ত ধূয়ো নয় বাবা, সেই ত সগেয় রথ! কাঙালীচরণ, বাবা আমার!

কি মা?

তোরা হাতের আঙুন যদি পাই বাবা, বামুন-মার মত আমিও সগেয়ে যেতে পাবো।

কাঙালী অক্ষুটে শুধু কহিল, যাঃ-বলতে নেই।



মা সে কথা বোধ করি শুনিতেই পাইল না, তপ্তনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল, ছোটোজাত বলে তখন কিছ্র কেউ ঘেন্না করতে পারবে না-দুঃখী বলে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। ইস! ছেলের হাতের আগুন,-রথকে যে আসতেই হবে।

ছেলে মুখের উপর মুখ রাখিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল, বলিস নে মা, বলিস নে, আমার বড্ড ভয় করে।

মা কহিল, আর দেখ কাঙালী, তোর বাবাকে একবার ধরে আনবি, অমনি যেন পায়ের ধুলো মাথায় দিয়ে আমাকে বিদায় দেয়। অমনি পায়ে আলতা, মাথায় সিঁদুর দিয়ে,-কিছ্র কে বা দেবে? তুই দিবি, না রে কাঙালী? তুই আমার ছেলে, তুই আমার মেয়ে, তুই আমার সব! বলিতে বলিতে সে ছেলেকে একেবারে বুকে চাপিয়া ধরিল।

অভাগীর জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্ক পরিসমাপ্ত হইতে চলিল। বিস্তৃতি বেশি নয়, সামান্যই। বোধ করি ত্রিশটা বৎসর আজও পার হইয়াছে কি হয় নাই, শেষও হইল তেমনি সামান্যভাবে। গ্রামে কবিরাজ ছিল না, ভিন্ন গ্রামে তাঁহার বাস। কাঙালী গিয়া কাঁদাকাটি করিল, হাতে-পায়ে পড়িল, শেষে ঘটি বাঁধা দিয়া তাঁহাকে এক টাকা প্রণামী দিল। তিনি আসিলেন না, গোটা-চারেক বড়ি দিলেন। তাহার কত কি আয়োজন। খল, মধু আদার সত্ত্ব, তুলসীপাতার রস-কাঙালীর মা ছেলের প্রতি রাগ করিয়া বলিল, কেন তুই আমাকে না বলে ঘটি বাঁধা দিতে গেলি বাবা! হাত পাতিয়া বড়ি কয়টি গ্রহণ করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া উনানে ফেলিয়া দিয়া কহিল, ভালো হই ত এতেই হবো, বাগদি-দুলের ঘরে কেউ কখনো ওষুধ খেয়ে বাঁচে না।

দিন দুই-তিন এমনি গেল। প্রতিবেশীরা খবর পাইয়া দেখিতে আসিল, যে যাহা মুষ্টিযোগ জানিত, হরিণের শিঙ-ঘষা জল, গঁটে-কড়ি পুড়াইয়া মধুতে মাড়িয়া চাটাইয়া দেওয়া ইত্যাদি অব্যর্থ ঔষধের সন্ধান দিয়া যে যাহার কাজে গেল। ছেলেমানুষ কাঙালী ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে, মা তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, কোবরেজের বড়িতে কিছু হলো না বাবা আর ওদের ওষুধে কাজ হবে? আমি এমনি ভালো হবো।

কাঙালী কাঁদিয়া কহিল, তুই বড়ি ত খেলি নে মা, উনুনে ফেলে দিলি। এমনি কি কেউ সারে?

আমি এমনি সেরে যাবো। তার চেয়ে তুই দুটো ভাতে-ভাত ফুটিয়ে নিয়ে খা দিকি, আমি চেয়ে দেখি। কাঙালী এই প্রথম অপটু হস্তে ভাত রাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। না পারিল ফ্যান বাড়িতে, না পারিল ভালো করিয়া ভাত বাড়িতে। উনান তাহার জ্বলে না-ভিতরে জল পড়িয়া ধুঁয়া হয়; ভাত ঢালিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে; মায়ের চোখ ছলছল করিয়া আসিল। নিজে একবার উঠবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মাথা সোজা করিতে পারিল না, শয্যা লুটাইয়া পড়িল। খাওয়া হইয়া গেলে ছেলেকে কাছে লইয়া কি করিয়া কি করিতে হয় বিধিমতে উপদেশ দিতে গিয়া তাহার ক্ষীণকণ্ঠ থামিয়া গেল, চোখ দিয়া কেবল অবিরলধারায় জল পড়িতে লাগিল।

গ্রামে ঈশ্বর নাপিত নাড়ী দেখিতে জানিত, পরদিন সকালে সে হাত দেখিয়া তাহারই সুমুখে মুখ গম্ভীর করিল, দীর্ঘশ্বাস ফেলিল এবং শেষে মাথা নাড়িয়া উঠিয়া গেল। কাঙালীর মা ইহার অর্থ বুঝিল, কিন্তু তাহার ভয়ই হইল না। সকলে চলিয়া গেলে সে ছেলেকে কহিল, এইবার একবার তাকে ডেকে আনতে পারিস বাবা?

কাকে মা?

ওই যে রে-ও-গাঁয়ে যে উঠে গেছে-

কাঙালী বুঝিয়া কহিল, বাবাকে?

অভাগী চূপ করিয়া রহিল।

কাঙালী বলিল, সে আসবে কেন মা?

অভাগীর নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তথাপি আস্তে আস্তে কহিল, গিয়ে বলবি, মা শুধু একটু তোমার পায়ের ধুলো চায়।

সে তখনি যাইতে উদ্যত হইলে সে তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, একটু কাঁদাকাটা করিস বাবা, বলিস মা যাচ্ছে।

একটু থামিয়া কহিল, ফেরবার পথে অমনি নাপতে-বৌদির কাছ থেকে একটু আলতা চেয়ে আনিস কাঙালী, আমার নাম করলেই সে দেবে। আমাকে বড় ভালোবাসে।

ভালো তাহাকে অনেকেই বাসিত। জ্বর হওয়া অবধি মায়ের মুখে সে এই কয়টা জিনিসের কথা এতবার এতরকম করিয়া শুনিয়াছে যে, সে সেইখান হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রা করিল।

পরদিন রসিক দু'লে সময়মত যখন আসিয়া উপস্থিত হইল তখন অভাগীর আর বড় জ্ঞান নাই। মুখের পরে মরণের ছায়া পড়িয়াছে, চোখের দৃষ্টি এ সংসারের কাজ-সারিয়া কোথায় কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গেছে।

কাঙালী কাঁদিয়া কহিল, মাগো! বাবা এসেছে-পায়ের ধুলো নেবে যে!

মা হয়ত বুঝিল, হয়ত বুঝিল না, হয়ত বা তাহার গভীর সঙ্কীর্ণ বাসনা সংস্কারের মত তাহার আচ্ছন্ন চেতনায় ঘা দিল। এই মৃত্যুপথ-যাত্রী তাহার অবশ বাহুখানি শয্যার বাহিরে বাড়াইয়া হাত পাতিল।

রসিক হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল। পৃথিবীতে তাহারও পায়ের ধুলোর প্রয়োজন আছে, ইহাও কেহ নাকি চাহিতে পারে তাহা তাহার কল্পনার অতীত। বিন্দির পিসি দাঁড়াইয়া ছিল, সে কহিল, দাও বাবা, দাও একটু পায়ের ধুলো।

রসিক অশ্রুসর হইয়া আসিল। জীবনে যে স্ত্রীকে সে ভালোবাসা দেয় নাই, অশ্রু-বসন দেয় নাই, কোন খোঁজখবর করে নাই, মরণকালে তাহাকে সে শুধু একটু পায়ের ধুলা দিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

রাখালের মা বলিল, এমন সতীলক্ষ্মী বামুন-কায়েতের ঘরে না জন্মে, ও আমাদের দু'লের ঘরে জন্মালে কেন!

এইবার ওর একটু গতি করে দাও বাবা-কাঙালীর হাতের আঙুলের লোভে ও যেন প্রাণটা দিলে।

অভাগীর অভাগ্যের দেবতা অগোচরে বসিয়া কি ভাবিলেন জানি না, কিন্তু ছেলেমানুষ কাঙালীর বুকে গিয়া এ কথা যেন তীরের মত বিধিল।

সেদিন দিনের বেলাটা কাটিল, প্রথম রাত্রিটা কাটিল, কিন্তু প্রভাতের জন্য কাঙালীর মা আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। কি জানি, এত ছোটজাতের জন্যও স্বর্গে রথের ব্যবস্থা আছে কি না, কিংবা অন্ধকারে পায়ে হাঁটিয়াই তাহাদের রওনা হইতে হয়,—কিন্তু এটা বুঝা গেল, রাত্রি শেষ না হইতেই এ দুনিয়া সে ত্যাগ করিয়া গেছে।

কুটির-প্রাঙ্গণে একটা বেলগাছ, একটা কুড়ল চাহিয়া আনিয়া রসিক তাহাতে ঘা দিয়াছে কি দেয় নাই, জমিদারের দারোয়ান কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার গালে সশব্দে একটা চড় কষাইয়া দিল; কুড়ল কাড়িয়া লইয়া কহিল, শালা, একি তোর বাপের গাছ আছে যে কাটতে লেগেছিস?

রসিক গালে হাত বুলাইতে লাগিল, কাঙালী কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, বাঃ, এ যে আমার মায়ের হাতে-পোঁতা গাছ, দারোয়ানজী। বাবাকে খামোকা তুমি মারলে কেন?

হিন্দুস্থানী দারোয়ান তাহাকেও একটা অশ্রাব্য গালি দিয়া মারিতে গেল, কিন্তু সে নাকি তাহার জননীর মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া বসিয়াছিল, তাই অশৌচের ভয়ে তাহার গায়ে হাত দিল না। হাঁকাহাঁকিতে একটা ভিড় জমিয়া উঠিল, কেহই অস্বীকার করিল না যে বিনা অনুমতিতে রসিকের গাছ কাটিতে যাওয়াটা ভালো হয় নাই। তাহারাই আবার দারোয়ানজীর হাতে-পায়ে পড়িতে লাগিল, তিনি অনুগ্রহ করিয়া যেন একটা ছকুম দেন। কারণ, অসুখের সময় যে-কেহ দেখিতে আসিয়াছে কাঙালীর মার তাহারই হাতে ধরিয়া তাহার শেষ অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া গেছে।

দারোয়ান ভুলিবার পাত্র নহে, সে হাত-মুখ বাড়িয়া জানাইল, এ-সকল চালাকি তাহার কাছে খাটিবে না।

জমিদার স্থানীয় লোক নহেন; গ্রামে তাঁহার একটা কাছারি আছে, গোমস্তা অধর রায় তাহার কর্তা। লোকগুলো যখন হিন্দুস্থানিটার কাছে ব্যর্থ অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিল, কাঙালী উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া একেবারে কাছারি-বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে লোকের মুখে মুখে শুনিয়াছিল, পিয়াদারা ঘুষ লয়, তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইল অতবড় অসঙ্গত অত্যাচারের কথা যদি কর্তার গোচর করিতে পারে ত ইহার প্রতিবিধান না হইয়াই পারে না। হয় রে অনভিজ্ঞ! বাংলাদেশের জমিদার ও তাহার কর্মচারীকে সে চিনিত না। সদ্যমাতৃহীন বালক শোকে ও উত্তেজনায় উদভ্রান্ত হইয়া একেবারে উপরে উঠিয়া আসিয়াছিল, অধর রায় সেইমাত্র সঙ্ক্যাহিক ও যৎসামান্য জলযোগান্তে বাহিরে আসিয়াছিলেন, বিস্মিত ও ত্রুদ্ব হইয়া কহিলেন, কে রে?

আমি কাঙালী। দারোয়ানজী আমার বাবাকে মেরেছে।

বেশ করেছে। হারামজাদা, খাজনা দেয়নি বুঝি?

কাঙালী কহিল, না বাবুমশায়, বাবা গাছ কাটতেছিল,—আমার মা মরেচে—বলিতে বলিতে সে কান্না আর চাপিতে পারিল না।

এই কান্নাকাটিতে অধর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। ছোঁড়াটা মড়া ছুঁইয়া আসিয়াছে, কি জানি এখানকার কিছু ছুঁইয়া ফেলিল নাকি! ধমক দিয়া বলিলেন, মা মরেচে ত যা নীচে নেবে দাঁড়া। ওরে কে আছিস রে, এখানে একটু গোবরজল ছড়িয়ে দে! কি জাতের ছেলে তুই?

কাঙালী সভয়ে প্রাঙ্গণে নামিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমরা দুলে।

অধর কহিলেন, দুলে ! দুলের মড়ার কাঠ কি হবে শুনি?

কাঙালী বলিল, মা যে আমাকে আগুন দিতে বলে গেছে! তুমি জিজ্ঞেস কর না বাবুমশায়, মা যে সবাইকে বলে গেছে, সন্ধ্যা গুনেছে যে! মায়ের কথা বলিতে গিয়া তাহার অনুক্ষণের সমস্ত অনুরোধ উপরোধ মুহূর্তে স্মরণ হইয়া কণ্ঠ যেন তাহার কান্নায় ফাটিয়া পড়িতে চাহিল।

অধর কহিলেন, মাকে পোড়াবি ত গাছের দাম পাঁচটা টাকা আন গে। পারবি?

কাঙালী জানিত তাহা অসম্ভব। তাহার উত্তরীয় কিনিবার মূল্যস্বরূপ তাহার ভাত খাইবার পিতলের কঁসিটি বিন্দির পিসি একটি টাকায় বাঁধা দিতে গিয়াছে সে চোখে দেখিয়া আসিয়াছে, সে ঘাড় নাড়িল, বলিল, না।

অধর মুখখানা অত্যন্ত বিকৃত করিয়া কহিলেন, না ত, মাকে নিয়ে নদীর চড়ায় পুঁতে ফেল গে যা। কার বাবার গাছে তোর বাপ কুড়ুল ঠেকাতে যায়—পাজি, হতভাগা, নচ্ছার!

কাঙালী বলিল, সে যে আমাদের উঠানের গাছ বাবুমশায়! সে যে আমার মায়ের হাতে পোঁতা গাছ।

হাতে পোঁতা গাছ! পাঁড়ে, ব্যাটাকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দে ত!

পাঁড়ে আসিয়া গলাধাক্কা দিল, এবং এমন কথা উচ্চারণ করিল যাহা কেবল জমিদারের কর্মচারীরাই পারে।

কাঙালী ধূলা বাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তার পরে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কেন সে যে মার খাইল, কি তাহার অপরাধ, ছেলেটা ভাবিয়াই পাইল না। গোমস্তার নির্বিকার চিন্তে দাগ পর্যন্ত পড়িল না। পড়িলে এ চাকরি তাহার জুটিত না। কহিলেন, পরেশ, দেখ ত হে, এ ব্যাটার খাজনা বাকি পড়েছে কি না। থাকে ত জাল-টাল কিছু একটা কেড়ে এনে যেন রেখে দেয়, —হারামজাদা পালাতে পারে।

মুখুয্যো-বাড়িতে শ্রাদ্ধের দিন-মাঝে কেবল একটা দিন মাত্র বাকি। সমারোহের আয়োজন গৃহিণীর উপযুক্ত করিয়াই হইতেছে। বৃদ্ধ ঠাকুরদাস নিজে তত্ত্বাবধান করিয়া ফিরিতেছিলেন, কাঙালী আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল, কহিল, ঠাকুরমশাই, আমার মা মরে গেছে।

তুই কে? কি চাস তুই?

আমি কাঙালী। মা বলে গেছে তেনাকে আগুন দিতে।

তাঁ দি গে না।

কাছারির ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল, একজন কহিল, ও বোধ হয় একটা গাছ চায়।—এই বলিয়া সে ঘটনাটা প্রকাশ করিয়া কহিল।

মুখুয্যো বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া কহিলেন, শোন আবদার। আমারই কত কাঠের দরকার,—কাল বাদে পরশু কাজ। যা যা, এখানে কিছু হবে না—এখানে কিছু হবে না। এই বলিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।



ভট্টাচার্য মহাশয় অদূরে বসিয়া ফর্দ করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, তোদের জেতে কে কবে আবার পোড়ায় রে? যা, মুখে একটু নুড়ো জ্বলে দিয়ে নদীর চড়ায় মাটি দে গে।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বড় ছেলে ব্যস্তসমস্তভাবে এই পথে কোথায় যাইতেছিলেন, তিনি কান খাড়া করিয়া একটু শুনিয়া কহিলেন, দেখচেন ভট্টাচার্যমশায়, সব ব্যাটারাই এখন বামুন-কায়েত হতে চায়। বলিয়া কাজের বোঁকে আর কোথায় চলিয়া গেলেন।

কাঙালী আর প্রার্থনা করিল না। এই ঘটনা-দুয়েকের অভিজ্ঞতায় সংসারে সে যেন একেবারে বুড়া হইয়া গিয়াছিল। নিঃশব্দে ধীরে ধীরে তাহার মরা মায়ের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।

নদীর চরে গর্ত খুঁড়িয়া অভাগীকে শোয়ান হইল। রাখালের মা কাঙালীর হাতে একটা খড়ের আঁটি জ্বলিয়া দিয়া তাহারই হাত ধরিয়া মায়ের মুখে স্পর্শ করাইয়া ফেলিয়া দিল। তার পরে সকলে মিলিয়া মাটি চাপা দিয়া কাঙালীর মায়ের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া দিল।

সবাই সকল কাজে ব্যস্ত,-শুধু সেই পোড়া খড়ের আঁটি হইতে যে স্বপ্ন ধূঁয়াটুকু ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল, তাহারই প্রতি পলকহীন চক্ষু পাতিয়া কাঙালী উর্ধ্বদৃষ্টি স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। □

**শব্দার্থ ও টীকা :** মুখ্যে - মুখোপাধ্যায় পদবীর কথ্যরূপ। বর্ষীয়সী - অতি বৃদ্ধ, সকলের মধ্যে বয়সে বড়, জীবচক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত। সঙ্গতিপন্ন - অর্থ-সম্পদের অধিকারী। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া - মৃত ব্যক্তির সৎকার, মৃত্যুর জন্য অন্তিম বা শেষ অনুষ্ঠান। সগ্য - স্বর্গ শব্দের কথ্যরূপ। অন্তরীক্ষ - আকাশ, গগন। ভুক্তাবশেষ - ভোজন বা খাওয়ার পরে পাতে যা পড়ে থাকে। প্রসন্ন - সন্তুষ্ট, খুশি। প্রসন্নমুখ - খুশি ভরা মুখ। ফ্রোড় - কোল। শশব্যস্ত - খরগোশ বা শশকের মতো ব্যস্ত। তেনার - তার, তাঁর। দুলে - পালকি বহনকারী হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ, নিচু জাতের মানুষ বলে অভিহিত। ইন্দ্রজাল - জাদুবিদ্যা, এখানে গল্পের মাধ্যমে মুগ্ধ বা মোহিত করে রাখার ক্ষমতাকে বোঝানো হয়েছে। রোমাঞ্চ - শিহরণ, অনুভূতির আধিক্যে গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যাওয়া। ভগ্নকণ্ঠ - বিকৃত স্বর, এখানে অতি আবেগে কাঙালীর ভাঙা বা বিকৃত স্বরে কথা বলা বোঝানো হয়েছে। প্রণামী-পুরোহিত বা দেব-দেবীকে দেওয়া সালামি। এখানে কবিরাজকে চিকিৎসা ফি হিসেবে দেওয়া টাকা বোঝানো হয়েছে। মুষ্টিযোগ - টোটকা চিকিৎসা। গঁটে কড়ি - কাঁটায়ুক্ত শামুক জাতীয় প্রাণি। নিস্তব্ধ - নিশ্চল, নিঃসঙ্গ। নির্বাক। হরিধ্বনি - হরি নামের ধ্বনি। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা মৃতদেহ বহন করার সময় সমবেতকণ্ঠে দেবতা হরির নাম উচ্চারণের বলে থাকে একে হরিধ্বনি বলে। সংস্কার - বিশ্বাস, বৌদ্ধ, আজন্ম লালিত ধারণা। অশন - খাদ্যদ্রব্য, আহারের বস্তু। সন্ধ্যাহ্নিক - সন্ধ্যাবেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের নিত্যকরণীয় পূজা।

**পাঠ-পরিচিতি :** সুকুমার সেন সম্পাদিত 'শরৎ সাহিত্যসমগ্র' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড থেকে 'অভাগীর স্বর্গ' নামক গল্পটি সংকলন করা হয়েছে। গরিব-দুখী নীচ শ্রেণির ছেলে কাঙালী। তার মা অভাগী। প্রতিবেশী উঁচু জাতের বাড়ির গৃহকর্ত্রীর মৃত্যুর পর সৎকারের দৃশ্য দেখে অভাগীর ভেতরকার ভাবানুভূতি প্রকাশের মাধ্যমে গুরু হয় এ গল্প। মৃতের শব্দাত্মক আড়ম্বরতা ও সৎকারের ব্যাপকতা দেখে অভাগীও নিজের মৃত্যু মুহূর্তের স্বপ্ন দেখে। চন্দন, সিঁদুর, আলতা, মালা, ঘৃত, মধু, ধূপ, ধূনা, অগ্নির ধোঁয়ায়

মুখুয্যে বাড়ির গিনি স্বর্গে গমন করেছেন। দুখিনী অভাগীও ভাবে তার মৃত্যুর সময় স্বামীর পায়ের ধূলি নিয়ে মৃত্যু শেষে পুত্র মুখাগ্নি করলে সেও স্বর্গে যাবে। মৃত্যুর সময় কাঙালী তার বাবাকে হাজির করতে পারলেও পারেনি কাঠের অভাবে মায়ের সংস্কার করতে। ‘অভাগীর স্বর্গ’ গল্পে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অমানবিক জাতিভেদ প্রথা এবং জমিদারি ব্যবস্থার শোষণ-নির্যাতনের ছবি এঁকেছেন। এ গল্প জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণি নিবিশেষে মানবিক হওয়ার শিক্ষা দেয়।

## অনুশীলনী

### কর্ম-অনুশীলন

- তোমার দেখা ধনী পরিবারের কারো মৃত্যু ও গরিব পরিবারের কারো মৃত্যুর তুলনামূলক বিবরণ দাও।
- কাঙালী যে মাতৃভক্তি দেখিয়েছে, এরকম কোনো ঘটনা লিপিবদ্ধ কর।

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- কোন নদীর তীরে শশ্মানঘাট অবস্থিত?
 

ক. শঙ্খ	খ. গরুড়
গ. গড়াই	ঘ. পদ্মা
- রসিক বেল গাছটি কী কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছিল?
 

ক. অভাগীর শবদাহ	খ. ঘরবাড়ি তৈরি
গ. রান্নার কাঠ সংগ্রহ	ঘ. কাঙালীর জন্য

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

তর্করত্ন কহিলেন, ধার নিবি শুধবি কীভাবে? গফুর বলিল, যেমন করে পারি শুধব বাবা ঠাকুর, তোমাকে ফাঁকি দেব না।

- তর্করত্ন অভাগীর স্বর্গ গল্পের কোন্ চরিত্রের প্রতিনিধি?
 

ক. ঠাকুর দাস মুখুজ্যে	খ. রসিক দুলে
গ. দারোয়ান	ঘ. অধর

### সৃজনশীল প্রশ্ন

এই নিষ্ঠুর অভিযোগে গফুর যেন বাকরোধ হইয়া গেল। ক্ষণেক পরে ধীরে ধীরে কহিল, কাহন খানেক খড় এবার ভাগে পেয়েছিলাম। কিন্তু গেল সনের বকেয়া বলে কর্তামশায় সব ধরে রাখলেন? কেঁদে কেটে হাতে পায়ে পড়ে বললাম, বাবু মশাই, হাকিম তুমি, তোমার রাজত্ব ছেড়ে আর পালাব কোথায়? আমাকে পণদশেক বিচুলি না হয় দাও। চালে খড় নেই। বাপ বেটিতে থাকি, তাও না হয় তালপাখার গৌজাগাঁজা দিয়ে এ বর্ষা কাটিয়ে দেব, কিন্তু না খেতে পেয়ে আমার মহেশ যে মরে যাবে।

- কাঙালীর বাবার নাম কী?
- ‘তোমার হাতের আগুন যদি পাই, আমিও সংগে যাব’ – উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
- উদ্দীপকে ‘অভাগীর স্বর্গ’ গল্পের যে সমাজচিত্রের ইঙ্গিত রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
- ‘কাঙালীর সঙ্গে উদ্দীপকের গফুরের সাদৃশ্য থাকলেও কাঙালী সম্পূর্ণরূপে গফুরের প্রতিনিধিত্ব করে না’ – মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর।